Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-V, Issue-III, January 2017, Page No. 01-12
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

হেমন্তবালা দেবীর কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ : কিছু প্রসঙ্গ

দেবাঙ্গনা সাধুখাঁ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Of all the luminaries who corresponded with Tagore (1861-1941), Hemantabala Debi (1894-1975) requires a special mention. A classicist in her preferences, she sought refuge in Tagore's philosophy to ease the difficulties of her troubled life. She wrote more than 300 letters to him. Tagore wrote 264. The correspondence continued for ten years-- 1931-1941. Her introspective queries persuaded Tagore to make a spontaneous revelation of his religious ideas in many of these letters. To the master, the disciple unveiled her mind, disclosed her preferences, convictions, beliefs, notions, and confessed her doubts.

Blessed by Tagore's love, Hemantabala was inspired to write though much of her works remained unpublished. She wrote many poems in these letters. The themes of her poems are varied: they speak of her personal relation with Tagore, her wishes and dreams, the triumphs and tribulations of everyday life, her search for transcendence and even some recipes!

It would be unwise to treat Hemantabala as a mere recipient of Tagore's letters. She is an institution in herself. Her stories, novels, essays prove her worth as a litterateur. The present study would essay to read some of the poems that she wrote on Tagore and shared with him.

Keywords: Rabindranath Tagore, Hemantabala Debi, Letters, Poems, Unpublished Works.

অধুনা বাংলাদেশের মৈমনসিংহের গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের বোন শরৎসুন্দরী দেবীর পুত্র ব্রজেন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরীর স্ত্রী ছিলেন হেমন্তবালা দেবী। একেবারেই ভিন্ন প্রেক্ষাপটের অস্তিত্বে বাঁচা এক নারীর বিদ্রোহ নিহিত ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি ছিলেন অভিজাত হিন্দু রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের অন্তঃপুরিকা। ১৯০৫-এ মাত্র দশ বছর বয়সে বিবাহের পর তিনি যান শ্বশুরালয়ে। স্বামীর সঙ্গে সঠিক পরিচয়ের পূর্বেই ১৯১৪-১৫ সাল নাগাদ তাঁকে স্বামীর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে দেওয়া হয়। মা অনন্তবালা দেবী যিনি অনুপ্রেরণা জোগাতে পারতেন, দ্বিধামুক্ত করতে পারতেন, তিনিই জোর করে দীক্ষিত করে দেন বৈষ্ণবধর্মে। স্বামীসান্নিধ্যে থাকতে বাধা দেন। একদিকে হেমন্তবালার নিজের পিত্রালয় অন্যদিকে শ্বশুরালয়ের পারম্পরিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হেমন্তবালা রয়ে গেলেন একা, নিঃসঙ্গ। এক কন্যা, এক পুত্রের জন্ম,

দ্বিধায়িত জীবন, সংসারী হয়েও কখনো যথার্থ সংসারী হয়ে উঠতে না পারা, দ্বিধাদীর্ণ, বিদ্রোহী হেমন্তবালার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু হয় ১৯৩১ সাল থেকে এবং সেই সময় থেকেই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির যথার্থ সূত্রপাত। হেমন্তবালা দেবী ছিলেন স্বশিক্ষিতা। নিজের চেষ্টাতেই শিখেছিলেন বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি, করেছিলেন শাস্ত্র ও সাহিত্য পাঠ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর রচনা পড়ে মুগ্ধ জোনাকি ওরফে হেমন্তবালা চিঠি পাঠিয়েছিলেন, উত্তরও পেয়েছিলেন। সেটা ছিল ১৯৩১। তারপর রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমন অর্থাৎ ১৯৪১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল সেই পত্রধারা। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণাতেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বহুদিন তিনি লোকচক্ষুর অগোচরেই ছিলেন। সাহিত্যের বেশিরভাগ প্রকরণেই ছিল তাঁর অবাধ গতায়ত। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর লেখায়।

১৯৩১-১৯৪১ -এই দশ বছরে রবীন্দ্রনাথকে লেখা হেমন্তবালার যতগুলি চিঠি পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে বহু চিঠিতেই তিনি গুরুদেবকে পাঠিয়েছেন কবিতা লিখে। তারিখ দিয়ে চিঠি লেখার অভ্যেস হেমন্তবালার প্রায় ছিল না। তাই কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৩১-১৯৪১-এর মধ্যেকার যেকোনো সময়ই হতে পারে। তাছাড়াও বেশ কিছু কবিতা রয়েছে যেগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁকেই কবিতার বিষয় করেছেন হেমন্তবালা দেবী। হেমন্তবালা দেবী রবীন্দ্রনাথকে প্রথম চিঠি লিখেছিলেন ১৯৩১ সালে। প্রথম চিঠিটিই ছিল কবিতা। তবে কবিতাটি পাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে হেমন্তবালা তাঁর 'পুরানোদিনের কথা'য় লিখছেন :

> *"...পরিচয় না দিয়েই 'জোনাকি দেবী' ছদ্মনামে একটি কবিতায় অভিনন্দন জানালাম তাঁকে। কবিতাটির পংক্তি ছিল, 'ওগো যোগাযোগ, শেষের কবিতা প্রণেতা।' পরবর্তী অংশ মনে নাই। সেতু রচিত হলো, অপ্রত্যাশিতভাবেই আমার প্রদত্ত ঠিকানায় চিঠির উত্তর এল, 'কল্যাণীয়া জোনাকি, তুমি আমার অন্তরের আশীর্বাদ গ্রহণ করো।'"*[১]

কবিতা দিয়েই শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ-হেমন্তবালার দশ বছরের পত্রমিতালীর দৃঢ় সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের ***যোগাযোগ***, ***শেষের কবিতা*** পড়ে শান্ত হয়েছিল হেমন্তবালা দেবীর মন। হেমন্তবালার শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু শ্রীশ্রীঠাকুর তখন সবে প্রয়াত কিন্তু সেই প্রয়াণের খবর পেয়েও স্বামীর আপত্তিতে তিনি সেখানে যেতে পারেননি, গৃহী জীবনে আটকে থাকতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। তাই বিদ্রোহ করে সিনেমা দেখা, নাটক-নভেল পড়া শুরু করেছিলেন, সেইসময়ই তাঁর হাতে আসে রবীন্দ্র উপন্যাস। দিশা পান হেমন্তবালা। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁরই মত একটি নারীর কথা লিখেছেন তাঁর রচনায়। আর তখনই কবিতায় সবার অজান্তে প্রণাম পাঠিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথের কাছে।
রবীন্দ্রনাথকে দ্বিতীয় কবিতাটি পাঠান ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১-এ। কবিতাটি নামহীন :

'জোনাকি চায় রবি! চরণে তব,'[২]

কবিতাটিতে আছে একটি নিবেদন, একটি ভিক্ষা। শ্রীশ্রীঠাকুর সদ্য প্রয়াত তখন। আশ্রম আর সংসারের টানাপোড়েনে দিশেহারা হেমন্তবালা চাইছেন রবীন্দ্রনাথের শরণ নিতে। আর তারই কাতর প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে কবিতাটিতে। নিজেকে, নিজের যন্ত্রণাকে তিনি যেন তুলে ধরতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে :

'যে গান দিয়ে গেছে আমার কানে
জপিতে আজীবন ধরে
যে গান ছাড়া মোর জগত মাঝে
নিজের আর কিছু নাই
সে গান ভুলে গেছি, কৃপায় তব
স্মরণে ফিরে পেতে চাই।।'[৩]

২৮/০১/৩৮-এ লেখা হেমন্তবালার রবীন্দ্রনাথকে প্রেরিত পরের কবিতাটিরও নাম নেই। কবিতাটি ভারি মজার। একটি কাঁথায় কিংবা ব্যাগে কবিগুরুকে চুরি করে সবার অলক্ষ্যে প্রকৃতির সান্নিধ্যে নিয়ে যেতে চাইছেন তিনি। যেখানে বৃদ্ধ গুরুদেবকে তিনি শিশু করে নিয়েছেন এমনকি তাঁর রচিত গানগুলি গাইয়েও নিয়েছেন তাঁকে দিয়েই। কিন্তু কিছুতেই যে হেমন্তবালার ইচ্ছেপূরণ হচ্ছে না। তাই তো এত কষ্ট তাঁর :

'হরিণছানার সঙ্গে তুমি করতে ছুটোছুটি
সিংহশিশুর পিঠে বসে গণ্‌তে দশন দুটি –
উপল 'পরে, চরণ রেখে ঝরণাধারায় ভিজে
আপন-রচা গান ক'খানি গাইতে তুমি নিজে
পাহাড় পাখী ভুলে যেত তাহার আপন গান
তোমার সুরেই সুর মিলিয়ে ধরত নূতন তান
স্বপ্ন সফল হয় না তো মোর ওগো স্বপন-সাথি
কি করব আর, তাইতো শুধুই ছড়া মালা গাঁথি।'[৪]

কবিতায় 'তুমি' সম্বোধন করছেন হেমন্তবালা কবিগুরুকে। বোঝা যায় সম্পর্কটি কতটা আন্তরিক ছিল। পরপর এই দুটি কবিতাই প্রকাশিত হয়েছে ***কবিকে লেখা চিঠি*** গ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথকে হেমন্তবালা যেসব কবিতা পাঠিয়েছেন তার বেশিরভাগই স্তুতিমূলক। যেন রবীন্দ্রনাথকে ভজনা করছেন তিনি। তাঁর অতুল গুণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে হেমন্তবালা ক্ষুদ্র বলছেন কখনো, কখনো বা বলছেন 'রবি' বড় হতে পারেন কিন্তু 'জোনাকি' তাঁর থেকে আলো নিয়ে নিজে আলোকিত হয় না। সুতরাং জোনাকিও মাথা তুলতে পারে স্পর্ধায়। নামহীন, তারিখহীন অনেক কবিতা নিবেদিত হয়েছে কবিগুরুর প্রতি :

'কচি কোমল কদলীপত্র গাঁথিয়া
আসন তোমার রেখেছি পাতিয়া।
মল্লিকা মালা দিয়েছি বুলায়ে যেখানে যেমন সাজে।'[৫]

আবার কখনো অন্য কবিতায় গুরুদেবকে নিবেদন করেছেন অন্তরের প্রণাম। যাঞ্চা করেছেন আশীর্বাদ :

'তুমি মোরে কর আশীর্ব্বাদ'
সকল অন্তর দিয়ে ও চরণে প্রণমিয়ে
মাগি আমি তোমার প্রসাদ।'[৬]

ঐ একই কবিতায় হেমন্তবালা গুরুদেবের কাছে যদি কোনোভাবে জ্ঞানে-অজ্ঞানে দোষ করে থাকেন তবে তার জন্য ক্ষমাও প্রার্থনা করছেন :

'আমার কতই দোষ করিও না তাহে রোষ
আশুতোষ তুমি স্নেহময়'[৭]

আবার অন্য একটি কবিতায় কবিকে বলছেন যেখানেই তিনি যাবেন সঙ্গে করে হেমন্তবালাকেও যেন নিয়ে যান গুরুদেব। এত কাছের করে, এত স্নেহ-প্রশ্রয় দিয়ে আর যে কেউ কখনো কাছে টেনে নেননি হেমন্তবালাকে। তাই তাঁর আবদার :

'যেথা যাও, যাও নিয়ে, গৈরিক আঁচল দিয়ে
ঢেকে নাও বিশাল অন্তরে।
লালিয়া পালিয়া স্নেহে, এখন এ বন-গেহে

একা ফেলে যেও না অন্তরে।।'[৮]

অন্য আর একটি কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথের শরণ চাইছেন হেমন্তবালা। জানাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথের স্নেহ থেকে কখনোই বঞ্চিত হতে পারবেন না তিনি :

'চাহিনা গো, মুক্তি নাহি চাই
স্নেহময় বক্ষোতলে অবিরল স্নেহাঞ্চলে
কিঞ্চিৎ শরণ যদি পাই।'[৯]

বারবার এই শরণাগত হবার আবেদন ঘুরে ফিরে এসেছে রবীন্দ্রনাথকে প্রেরিত হেমন্তবালার কবিতায়।

'বিশ্বকবি ও জোনাকি', 'জোনাকির প্রতি রবি' ইত্যাদি কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে একটি কথোপকথন। হেমন্তবালা দেবীর ছদ্মনাম 'জোনাকি'। আর 'রবি' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অপর নাম। হেমন্তবালা আর রবীন্দ্রনাথ যেন সামনা-সামনি বসে কথা বলেছেন এই কবিতায়। শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথের অনেক স্তাবকবৃন্দ জুটেছিল। যার জন্য তাঁর ঐশ্বর্যশালী লেখনী কিঞ্চিৎ শ্লথ হয়ে পড়েছিল বলে হেমন্তবালার ধারণা হয়েছিল। তাই হেমন্তবালা লিখছেন :

'"হে সবিতা! ভালবাসি, ঈর্ষ্যা করি,
উগ্রতেজে তব
যখন আকাশ সুনীল প্রভায় ঝল্‌সে ওঠে
তোমার মহিমায়
এখন তোমার নিষ্প্রভতা আন্‌ছে মারি!
চিত্ত বেদন নব
ব্যথা কৃপার পাত্র তুমি, ভারতে ফোটে
শেল যেন হিয়ায়।"
মুচ্‌কে হেসে বলেন কবি, "বেশ জোনাকি
বক্তৃতাটি ভালো
ধন্যবাদ! এ সমবেদন মানায় শুধু
তোমারি ও মুখে!
রাত্রিকালে মিহির কভু ঘুমায় নাকি?
থাকে না তার আলো?"[১০]

প্রবীন কবিকে তিনি নবীন করে নিতে চাইছেন। যাতে আবার ক্ষুরধার হয় কবিগুরুর লেখনী তাই তো বলছেন :

'ভুলে যাবে বন্ধু তুমি কত প্রবীন
বিজ্ঞ পুরুষ মানী
ভুলে যাবে বিষয়ীদের বিষ-বিদাহন
নকল ভোজন শত
জোনাকি আজ করবে তোমায় চিরনবীন'[১১]

আবার 'জোনাকির প্রতি রবি' কবিতায় রবি ও জোনাকির কথোপকথনে হেমন্তবালা ভাবছেন যেন রবি দেখতে চাইছেন জোনাকিকে। রবীন্দ্রনাথকে যখন চিঠি লেখা শুরু করেছিলেন হেমন্তবালা। তখন 'জোনাকি' ছদ্মনামটুকুই ছিল আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথকে হেমন্তবালা আর কোনো পরিচয় দেননি সেদিনও। পরিবারে সবটা জানাজানি হয়ে যায় এই ছিল হেমন্তবালার ভয়, আবার সবার সামনে নিজেকে প্রকাশ করাতেও ছিল তাঁর কুণ্ঠা, তাই এই আড়ালটুকুর প্রয়োজন

ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই আড়ালটুকুকে শ্রদ্ধা করেই তা বজায় রেখেছেন সবসময়। অনেক পরে তিনি জানতে পেরেছিলেন হেমন্তবালার আসল পরিচয়। এই কবিতায় জোনাকি ওরফে হেমন্তবালা মনে করছেন রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁকে দেখতে চাইছেন, জানতে চাইছেন তাঁর আসল পরিচয়। সঙ্গে রয়েছে জোনাকির উত্তরও :

'ও জোনাকি বালা!
আঁখির আগে এসে দাঁড়াও
দেখি রূপের আলা"
জোনাকি কয় "মোর পরিচয়
আড়াল থেকেই হবে নিতে
তোমার সাথে আমার আলাপ
সুলভ তো নয় ধরণীতে'[১২]

'রবি ও জোনাকি' কবিতায় হেমন্তবালা ঠাট্টা করে বলছেন রবির আলো আছে বলেই কি জোনাকিকে ম্লান হয়ে থাকতে হবে? জোনাকিই বা ছোট কিসে? একাই কবিগুরু কবিতা লিখতে পারেন। হেমন্তবালা কি পারেন না?

'সূক্ষ্ম রূপে সূর্য্য তুমি
জগৎ সবিতা
বিশ্বে না হয় ছড়ায়েছ
তুমিই কবিতা।
কিন্তু সবাই দেখে রবি!
জোনাকি তার আপন ছবি
আপন মনের কাব্য লয়েই
হয় পুলকিতা'[১৩]

এত বড় একজন মানুষের সঙ্গে হেমন্তবালার সখ্যতা উচ্চ পর্যায়েরই ছিল তাই তিনি এমন রসিকতা করে রবীন্দ্রনাথকে কবিতা পাঠাতে পারেন। রবীন্দ্রনাথও যে কোনো স্তরের মানুষের সঙ্গেই পারতেন অনায়াস রসিকতায় মাততে। যে নারী কখনো আলোকিত হতে চাননি, আলোচিত হতে চাননি, তিনিই রবীন্দ্রনাথকে কেমন করে পেয়েছিলেন এমন একটা আশ্রয়স্থল হিসেবে, ভাবলে অবাক হতে হয়।

'সংবর্দ্ধনা' কবিতাটিতেও পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের এমনই কিছু স্তুতিচিত্র।

আবার অনেক ভক্তের ভিড়ে যদি হারিয়ে যান হেমন্তবালা, যদি রবীন্দ্রনাথ ভুলে যান তাঁকে এই আশঙ্কার কথাও ব্যক্ত হয়েছে একটি নামহীন কবিতায় :

'লক্ষ হিয়ার পূজাঞ্জলি,
সুগন্ধে প্রাণ সুচঞ্চলি।
ঢাকবে রাঙা চরণ তোমার সকল বাঞ্ছা পূরায়ে।।
সেদিন কি গো থাকবে মনে
ক্ষুদ্র জোনাকির কথা,
সেদিন কি গো অন্য মনা
করবে তোমায় তার ব্যথা?'[১৪]

এমনই অন্য একটি কবিতায় হেমন্তবালার মনে হয়েছে জীবনের অনেকটা সময় কেটে যাবার পড়ে দেখা হয়েছে তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। আরও কিছুদিন আগে যদি এই দেখা হত হয়ত এত দ্বন্দ্বায়িত হত না তাঁর জীবন। আরও একটু বেশি সান্ত্বনা, আরও একটু স্নেহ পেতেই পারতেন তিনি :

'আর কি সেদিন আছে?
দাঁড়াব যখন শৈশব-মুখে
তোমার কোলের কাছে?
.....
আজ আসিয়াছি এ অপরাহ্ণে
শুষ্ক ফুলের মত
উড়িয়া গিয়াছে সৌরভ মোর
হয়েছি কীটক্ষত
তবু মনে হয়, হারাব না কৃপাকণা,
হবে না বিফল জীবনের উপাসনা,
পাব কিছু স্থান, পাব কিছু দাম
সিঞ্চিত স্নেহজলে
তাইত আশায় লুটাইতে চায়
এ চিত চরণ-তলে।।'[১৫]

১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে লেখা দুটি নামহীন কবিতাতেও পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের বন্দনা গান। হেমন্তবালার মত ক্ষুদ্র প্রাণকেও গুরুদেব স্থান দিয়েছেন চরণে এ যে হেমন্তবালার অনেক বড় পাওয়া :

'ক্ষুদ্রের মান বাড়ায়েছ তুমি, হয়েছ স্পর্শমণি
তাইতো বিশ্ববল্লভ-প্রতিবিম্ব তোমারে গণি।।'[১৬]

'মেঘদূত' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কাছে মেঘকে দূত করে পাঠাচ্ছেন হেমন্তবালা। মেঘের সঙ্গে কবিকে পাঠাচ্ছেন অন্তরের ভক্তি, প্রণাম। আর মেঘকে দিচ্ছেন নির্দেশ :

'মোর চিত্ত-নিদর্শন নিজরূপ দেখাইবে তায়
বরষা-ধারায়
করিয়া তাহারে স্নিগ্ধ প্রেম-পরশন
জিজ্ঞাসিও, কবে হবে বিপ্রলব্ধ চিতে মোর
শান্তি-বরষণ।।'[১৭]

'ধ্রুব জিজ্ঞাসা' কবিতায় সুয়োরাণী, দুয়োরাণীর উল্লেখ না থাকলেও একটি গল্প আছে। রাজার পুত্র হয়েও একটি ছেলে ও তার মা অরণ্যে নির্বাসিত। আসলে আমাদের সমাজব্যবস্থাই যে এমন। নারী যদি অপছন্দের হয় তবে তাকে নির্বাসন দেওয়াই তো দস্তুর। আর সেই নারীর সন্তান যদি রাজার ঔরসজাতও হয় তাহলেও নির্বাসিতা নারীর সন্তানের ভার রাজা নেন না কখনো। তাইতো হরিণ শিকার করেই মা-ছেলের পেট প্রতিপালন করতে হয়। সেই রাজার ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় তার পিতৃপরিচয়, কেন সে আজ ভিখারী প্রশ্ন রাখে মায়ের কাছে। মা যখন নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে তখন সে অনুভব করে রাজ্যবল তার দরকার নেই, তার যে মা আছে, এতেই যে তার সারাজীবন কেটে যাবে :

'কোলে নে মা, ঢেকে নে মা, খোল্ আঁচল

তুই মা আমার রত্ন-ভূষণ, তুই মা আমার রাজ্যবল।'[১৮]

হেমন্তবালা রবীন্দ্রনাথকে কিছু রূপকথা লিখে পাঠিয়েছিলেন। যার সংকলন প্রকাশের আগ্রহও ছিল কবিগুরুর। এমনই একটু রূপকথার আদল রয়েছে তাঁর এই কবিতাটিতে।

'সুনীতিসম্ভাষা', 'প্রদোষিকা', 'ধ্রুবতারা'ইত্যাদি কবিতায় আছে প্রকৃতির বর্ণনা। আছে নক্ষত্র, আকাশ, ধ্রুবতারা, ভোরের অনুপম রূপের কথা।

'পরিতপ্তা' কবিতাটিতে আছে হেমন্তবালার জীবনের কথা, আক্ষেপের কথা :

'যে ফুল-কলিকাটি-কুঁকড়ি' যায়,
সে কি প্রফুট শোভা ধরিতে পায়।
যে ফল কচিবেলা
ভখিল কীটমেলা
সে কি পাকিবে কভু রস-সুধায়?'[১৯]

ছোটবেলা থেকে বাবা-মায়ের স্বাধীনতা, প্রশ্রয় পেলেও শৈশবেই তাঁর বিবাহের সিদ্ধান্ত ভুল জীবনের পথে তাঁকে ঠেলে দিল। মাত্র ১৪/১৫ বছর বয়সে মায়ের জন্য অনিচ্ছাবশতই নিলেন বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা। তাই তো এই তুলনা। খুব অল্প বয়সেই এই ভুল সিদ্ধান্ত ও পারিবারিক দ্বন্দ্বে ফুটতে পারল না হেমন্তবালার জীবনফুলটি। এই কবিতার শেষে তাই তিনি সব বিড়াম্বনা অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথে আত্মসমর্পণ করেছেন। কবির কাছে তাঁর প্রার্থনা :

'বাঁচাও মোরে কবি!
নবীন ভোরে
এখনি ঘিরে আসে
তামসী, হে হুতাশে
ভাসি যে ঘোরে।'[২০]

তিনি বলছেন রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়ে তিনি যেন বিভোর হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথ যেন সেই সম্পর্ক থেকে তাঁকে বঞ্চিত না করেন :

'না, না, মোর ঘুম ঘোর
কেহ তো ভাঙ্গাতে নারে।
সোনার স্বপনে আমি
ডুবিয়াছি একেবারে।।
.....
তুমি এসো, মম শিরে
পরশিয়ে করখানি
পারো যদি, গাহ তব
নব-জাগরণ-বাণী'[২১]

কবি যেন হেমন্তবালার কাছে পরিত্রাতার ভূমিকায় আবির্ভূত এই কবিতায়। বারবার কাছের মানুষদের কাছে না পাবার বেদনা তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছে সারা জীবন। তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে বারবার সেই প্রসঙ্গ এসেছে। তাই শেষ পরম আশ্রয়স্থল কবিশ্রেষ্ঠকে তিনি হারাতে চাননা কোনোভাবেই।

হেমন্তবালা দেবীর প্রথম দিকের লেখা কবিতা 'বন্ধুর প্রতি'। কবিতাটি ***বিশ্বভারতী পত্রিকা***-য় ১৪২০ বঙ্গাব্দে বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায়, শ্রী অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। একইসঙ্গে রয়েছে 'আমার দেবতা' নামের আরও একটি কবিতা।

'বন্ধুর প্রতি'-তে হেমন্তবালা রবীন্দ্রনাথকে একেবারে বন্ধু হিসাবেই সম্বোধন করে বলছেন রবীন্দ্রনাথের পাঠানো চিঠি তিনি অসংখ্য বার পড়েছেন বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থায়। রবীন্দ্রনাথের ধ্যান করতে করতে প্রিয়জনদের নামই ভুলতে বসেছেন হেমন্তবালা। এতো ক্ষুদ্র প্রাণ হয়েও তিনি যে অবকাশ পেলেন, প্রশ্রয় পেলেন কবির কাছে, এতেই তিনি বিধাতার কাছে প্রণাম জানাচ্ছেন।

এই পত্রিকায় পরের প্রকাশিত কবিতা 'আমার দেবতা'। যেখানে হেমন্তবালা রবীন্দ্রনাথের দেহকান্তির বিবরণ লিখেছেন কবিতাকারে। রবীন্দ্রনাথের দেবোপম রূপে মোহিত হয়েছিলেন তিনি। নাহলেই বরং আশ্চর্য ছিল। বোঝা যায় হেমন্তবালার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ তখন শুধুমাত্র পত্রালাপেই সীমাবদ্ধ নেই। হেমন্তবালা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তখন প্রায়ই সশরীরে সাক্ষাৎ করতে যেতেন বাড়ির গাড়ি চড়েই। ততদিনে তাঁদের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা প্রকাশিত হয়ে গেছে পরিবারের সবার কাছে :

'প্রভাত রবির তরুণ কিরণ লাবণি জড়িত অঙ্গ।
চন্দ্র উজল আসনে তাহার হসিত সুধাতরঙ্গ।।'[২২]

তিনের দশকে রবীন্দ্রনাথকে হেমন্তবালা পাঠাচ্ছেন 'ছন্দহারা' কবিতাটি। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কবে কোথায় তা জানা যায়নি। কবিতাটি ***কবিকে লেখা চিঠি*** গ্রন্থেও মুদ্রিত হয়েছে। এই কবিতায় হেমন্তবালা বলছেন কবি তাঁকে সব ভুলিয়ে দিচ্ছেন। তিনিই হেমন্তবালার মুখে বাণী ফোটাচ্ছেন। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে হেমন্তবালার, তাই তো কবিতার নামটিই এমন। এই প্রথম কবিকে কবিতার মাধ্যমে তিনি নিজের কথা নিজেই বলছেন, কখনো এমনটা ঘটেনি এর আগে :

'কাহারো কাছে যাইনি আমি সরমলাজে
তোমারে আমি দেখিনু যেন আমারি সাজে
তাই তো আজি লাজেরে লাজি'
আপন সুরে আপনি বাজি
উলাসে হাসি সোহাগে গলি
আপন কথা আপনি বলি
আমারি বাণী পশিছে মম মরম মাঝে
আমারি কানে আমার গানে দরদ বাজে'[২৩]

এখানেও রয়েছে সেই আন্তরিকতা তাই কবিকে তিনি 'আপনি' থেকে 'তুমি' সম্বোধন করছেন এই কবিতায়। শেষে আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছেন কবিকে যে হেমন্তবালা কবিরই চরণাশ্রিতা :

'শরমে মোর বচন হত
নিঝর বালা শরণাগত
তোমার ভাব লহরে 'মিশি' মরমে মরে
লুটাতে চাহে চরণ 'পরে।।'[২৪]

'অর্থহীন কবিতা' নামের কবিতায় হেমন্তবালার সঙ্গে যেন হঠাৎ সাদৃশ্য পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' গল্পের নায়িকার। যে নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। এই কবিতাটিতে হেমন্তবালা যেন ভেঙে গড়েছেন নিজেকে।

যা তিনি কখনো বলেননি তাই লিখেছেন এই কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেয়ে তাঁর মনে হয়েছে তিনিই এই পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী। তাই বলেছেন :

'অয়ি কল্পনিকা!
গরবিনী গৌরবিনী অন্তর-নায়িকা!
শুনি তব বাণী।
"আমি পৃথিবীর রাণী।
আমার লাগিয়া ঊর্দ্ধে ফিরে যত দীপ্ত নভশ্চর।
আমার লাগিয়া নিম্নে উদ্বেলিত অনন্ত সাগর।
আমার লাগিয়া অভ্রে তীব্র বাজ করে হানাহানি
আমারি লাগিয়া বায়ু বিশ্বমনে করে কানাকানি
হে মানব, কহি শুন বাণী,
আমি সেই পৃথিবীর রাণী।।'[২৫]

সাধিকা বৈষ্ণবী হেমন্তবালার রাজ্যেশ্বরী হবার এই বাসনা এই একটি মাত্র কবিতাতেই উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। 'মর্ম্মদেবতার প্রতি' কবিতায় তিনি কাতর হয়েছেন নিজের বন্দী জীবন থেকে মুক্ত হবার আশায়। আশ্রম আর সংসারের টানাপোড়েনে ক্ষত-বিক্ষত হেমন্তবালা তাই পরিত্রাণ চেয়েছেন 'কারাগার' থেকে :

'কারাগার
বেঁধেছে আমায়
পথ নাহি পায়
উতলা খঞ্জন দুটি পিঞ্জর ভিতরে
মিছামিছি পাখা ঝাপটিয়ে মরে
কোথা তুমি
ওগো মোর প্রিয় বন-ভূমি,
হে উদার মহাকাশ
লহ নিজপাশ,
দেখা দাও হে কাণ্ড রুচির
মাগি নতশির।'[২৬]

এবার যে কবিতাগুলির কথা বলতে হয় তাদেরও বেশিরভাগেরই নাম ও তারিখ পাওয়া যায়নি। এগুলি রবীন্দ্রনাথকে প্রেরিত কবিতাও নয়। কিন্তু জীবনের বিভিন্ন সময়ে হেমন্তবালা রবীন্দ্রনাথকে বিষয় করে কিছু কবিতা লিখেছেন।

এইরকমই একটি কবিতাতে হেমন্তবালা আঁকছেন বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের দাবদাহে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা মানুষের ছবি। বর্ষার অপেক্ষায় তখন দিন গুনছে সবাই। কিন্তু বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ যতই তীব্র হোক হেমন্তবালার কাছে তা যে পরম কাম্য কারণ বৈশাখেই যে কবিগুরুর জন্ম :

'নববর্ষার সুনীল জলদ অবশ্যই সু কবির পরম প্রিয়।
কিন্তু আমার স্বর্ণরবির মৃদুল কিরণ অধিক রমণীয়।।
জ্যৈষ্ঠ ভানুর দারুণ প্রখর দুঃসহ উত্তাপে
যখন লোকে দুঃখে সময়

তখনো এই স্বর্ণ কিরণ চক্ষে লাগে ভালো,
মাগে জীবন আলো আরো আলো।।'[২৭]

১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে হেমন্তবালা কবিগুরুকে পাঠালেন রান্নার রেসিপি কবিতাকারে। সেই কবিতাটি কোনো একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সংকলক ছিলেন অনিন্দিতা বসু। কিন্তু পত্রিকার নাম বা প্রকাশের তারিখ পাওয়া সম্ভব হয়নি। এই পত্রিকা থেকে জানতে পারা যায়, এই চিঠিটির উত্তর রয়েছে ***চিঠিপত্র*** নবম খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের লেখা ১৭ নম্বর চিঠিতে। হেমন্তবালার চিঠিটি পড়ে কবিগুরুর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী কয়েকটি পদ রেঁধে খাইয়েছিলেন কবিকে। কবিতাটি দীর্ঘ হওয়ায় কবিতাটির কিছুটা অংশ প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকায়। বিভিন্ন পদ রান্নার হদিশ দিয়েছেন হেমন্তবালা। বলেছেন :

'বন্যকচুর মান্য যেথা
আদার সকল কর্ম সেথা
ওলের দেশের মেয়ে।
লঙ্কাদ্বীপের নইকো বধূ
তবুও হায় লঙ্কা মধু মিষ্টি সবার চেয়ে।।'[২৮]

কিংবা শেখাচ্ছেন শুক্তো রান্না :

'হিঞ্চে গীমে, পলমা নিমে, রাঁধবো কিগো
বেগুন সিমে?
সজনে দিয়ে ঝোল?
সরষে বাটা ফোরন মেথি
বড়ি তাহার ব্যথার ব্যথী
অন্তরে বিভোল,
গাওয়া ঘৃত তিক্ত ঝোলে
নাটোর রাজের চিত্ত ভোলে
আস্বাদিতে চাও?'[২৯]

মজা করে ছন্দ মিলিয়ে পদ্যাকারে রবীন্দ্রনাথকে পাঠাচ্ছেন রান্নার রেসিপি। এই কবিতাটিও স্থান পেয়েছে ***কবিকে লেখা চিঠি*** গ্রন্থটিতে।

২২ শ্রাবণ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে পুরীতে বসে 'বাইশে শ্রাবণ' নাম দিয়ে একটি কবিতা লিখছেন তিনি। এই দিনটি হেমন্তবালার কাছে দুঃসহ। তবু এই দিনটিতেই তিনি শুনতে চাইছেন কবির বাণীকে। যা দিয়ে দূরীভূত হবে তাঁর জীবনের সমস্ত শোক-তাপ :

'তুমি কি বাণী লইয়া এলে আজি।
অগ্নিবীণায় তব কিসুর উঠলো হৃদে বাজি
শান্তি-শান্তি হোক।
পুড়ে যাক জীবনের গ্লানি।'[৩০]

বিচিত্রা পত্রিকার ১৩৪০ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালার সম্মতি নিয়েই 'ব্যর্থ' নামের একটি কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। আরও আগে যদি তাঁর সাক্ষাৎ হত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তবে আরও দৃঢ় বন্ধনে বাঁধতে

পারতেন তিনি রবীন্দ্রনাথকে। এত চিঠি লিখেও সেই মনোবাসনা ব্যর্থ হয়েই রইল। এই কবিতায় ধরা রয়েছে সেই অসফলতার কথা। এখানে হেমন্তবালা বেশ সপ্রতিভ, বেশ সাহসীও :

'ফিরিয়া গিয়াছে ব্যর্থ রজনী
কাঁদিয়া গিয়াছে পাপিয়া।
বৃথাই অলস জাগর যামিনী যাপিয়া।
তোমার আমার মিছা দেখাদেখি
দিঠিতে দিঠিতে চিঠি লেখালেখি,
পুলকে কাঁপিয়া কাঁপিয়া'[৩১]

হেমন্তবালার মনের সমস্ত বাসনা অনর্গলিত হয়েছে এই কবিতাটিতে।

চিঠিতে পাঠানো কবিতাগুলি কবিগুরু পাঠ করতেন নিতান্ত মনোযোগ দিয়েই। তাই রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে হেমন্তবালাকে লিখেছিলেন :

'তোমার চিঠিতে তোমার কবিতার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে আমি বিস্মিত হয়েচি। অত্যন্ত খাঁটি কবিতা, বানানো নয়, পরিণত লেখনীর সৃষ্টি।'[৩২]

অবশ্যই এতে মিশে আছে কবিগুরুর প্রশ্রয়। তবু হেমন্তবালা দেবীর জীবনে অনেক টুকরো প্রসঙ্গ, স্মৃতি, সম্পর্ক, বাসনা ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর রবীন্দ্রনাথকে প্রেরিত ও রবীন্দ্রনাথকে বিষয় করে রচিত কবিতা গুলিতে।

রবীন্দ্র স্নেহধন্য ছিলেন হেমন্তবালা দেবী। কবিগুরুকে পাঠানো তাঁর কবিতাগুলিতে আছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক, তাঁর ইচ্ছে, তাঁর প্রশ্ন, রন্ধন প্রণালী, তাঁর জীবনের নানা যন্ত্রণা এবং তা থেকে উত্তরণের পথজিজ্ঞাসা। হেমন্তবালা যে শুধুই রবীন্দ্র পত্রপ্রাপিকা নন, স্বকীয়তায়, নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে যে তিনি উজ্জ্বল অবশ্যই তাঁর এই কবিতাগুলিই তা প্রমাণ করে।

তথ্যসূত্র :

১। যশোধরা বাগচী ও অভিজিৎ সেন (সম্পা.), হেমন্তবালা দেবীর রচনা সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১১৭।
২। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়ন্তী সান্যাল (সম্পা.), কবিকে লেখা চিঠি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১।
৩। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ২।
৪। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ২, পৃষ্ঠা-১৫।
৫। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রভবন অভিলেখ্যাগার থেকে সংগৃহীত, ফাইল নং-৮৭৬।
৬। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৫।
৭। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৫।
৮। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৫।
৯। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৫।
১০। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৫।
১১। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৫।
১২। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৫।
১৩। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৫।

১৪। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৫।
১৫। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৫।
১৬। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৫।
১৭। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৫।
১৮। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৫।
১৯। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৫।
২০। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৫।
২১। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৫।
২২। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা.), বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪২০, পৃষ্ঠা-২০।
২৩। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ২, পৃষ্ঠা- ১২৫-১২৬।
২৪। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ২, পৃষ্ঠা-১২৬।
২৫। হেমন্তবালা দেবীর মূল পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত।
২৬। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ২৫।
২৭। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ২৫।
২৮। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ২, পৃষ্ঠা-২৯।
২৯। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ২৮।
৩০। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ২৫।
৩১। পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ২৫।
৩২। পুলিনবিহারী সেন (সংকলিত ও সম্পাদিত), চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রকাশ- বৈশাখ ১৩৭১, পরিবর্ধিত সংস্করণ-বৈশাখ ১৪০৪(কানাই সামন্ত ও সনৎ কুমার বাগচী কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত), পৃষ্ঠা-৮।